ছাগল পালন কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপ (সিআইজি)

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

উন্নত/আধুনিক প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ

Training on Improved/Modern Livestock Technology Management and Practice

প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল ঃ ১ দিন

উপদেষ্টা

ডা: মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদা
পরিচালক
পিআইইউ, এনএটিপি-২, ডিএলএস

সম্পাদনায়

ডা: মোহাম্মদ সালেহউদ্দিন খান
ট্রেনিং এন্ড কমুউনিকেশন স্পেশালিস্ট
পিআইইউ, এনএটিপি-২, ডিএলএস

সহযোগিতায়

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (পিআইইউ) : প্রাণিসম্পদ অংগ
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ ওও প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (পিআইইউ): প্রাণিসম্পদ অংগ
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
উপজেলা ঃ ---------- জেলা ঃ ----------

প্রশিক্ষণ শিরোনাম ঃ ছাগল পালন কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপ (সিআইজি) খামারী/কৃষক সদস্যদের উন্নত/আধুনিক প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার (CIG Farmers Training on Improved / Modern Livestock Technology Management and Practice).

প্রশিক্ষণের মেয়াদ ঃ ১ দিন।

প্রশিক্ষণের তারিখ ঃ -----/-----/------

প্রশিক্ষণের স্থান ঃ ----------

অংশগ্রহণকারী ঃ (সিআইজি এর নাম) ছাগল পালন সিআইজি খামারী/কৃষক

অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ঃ ৩০ জন

প্রশিক্ষণ সূচী

সেশন	সময়	প্রশিক্ষণের বিষয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী
১ম সেশন	০৮.৩০ – ০৯.০০	প্রশিক্ষণার্থীদের নাম নিবন্ধন	প্রশিক্ষণ সংগঠক (Training Organizer)
	০৯.০০ – ০৯.৩০	প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন	প্রশিক্ষণ সংগঠক (Training Organizer)
	০৯.৩০ – ১০.৩০	দারিদ্র বিমোচনে ছাগল পালন, ছাগলের উন্নত জাত নির্বাচন ও ছাগল পালনের বিভিন্ন পালন পদ্ধতি	প্রশিক্ষক (Resource Speaker)
২য় সেশন	১০.৩০ – ১১.০০	চা- বিরতি	
	১১.০০ – ১২.০০	ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা	প্রশিক্ষক (Resource Speaker)
৩য় সেশন	১২.০০ – ১৩.০০	ছাগলের বাসস্থান ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা	প্রশিক্ষক (Resource Speaker)
	১৩.০০ – ১৪.০০	নামাজ ও মধ্যাহ্ন বিরতি	
৪র্থ সেশন	১৪.০০ – ১৫.০০	ছাগল প্রজনন, পাঠা পালন, দুগ্ধবতী ও গর্ভবতী ছাগী এবং নবজাত ছাগলের বাচ্চার পরিচর্যা	প্রশিক্ষক (Resource Speaker)
৫ম সেশন	১৫.০০ – ১৬.০০	সিআইজি সদস্যদের কার্যক্রম; পরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তা	প্রশিক্ষক (Resource Speaker)
	১৬.০০ – ১৬.৩০	চা - বিরতি	
	১৬.৩০ – ১৭.০০	প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও প্রশিক্ষণ সমাপনি অনুষ্ঠান	প্রশিক্ষণ সংগঠক (Training Organizer)

অধিবেশন পরিকল্পনা

প্রশিক্ষণ শিরোনাম ঃ ছাগল পালন কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপ (সিআইজি) খামারী/কৃষক সদস্যদের উন্নত/আধুনিক প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার (CIG Farmers Training on Improved / Modern Livestock Technology Management and Practice).

প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্য ঃ

- ছাগল পালন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার সম্পর্কে সিআইজি সদস্যদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করণ।
- ছাগল খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ।

প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রত্যাশা ঃ

- প্রশিক্ষণের ফলে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার সম্পর্কে কৃষক/খামারীদের দক্ষতা ব্যবধান কমবে।
- কৃষক/খামারীগন এর দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং তাঁরা নিজেরাই খামারের সমস্যা চিহ্নিত করতে পারবে।
- কৃষক/খামারীগন প্রশিক্ষণে লব্ধ জ্ঞান নিজ খামারে বাস্তবায়ন করে খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করবে এবং এ বিষয়ে নন-সিআইজি কৃষক/খামারীগনকে পরামর্শ দিতে পারবে।

প্রশিক্ষণার্থীদের নাম নিবন্ধন ঃ

এনএটিপি-২ এর আওতায় নতুন উপজেলাগুলোতে প্রতি ইউনিয়নে ০৩টি করে সিআইজি এবং প্রতি সিআইজিতে ৩০জন খামারী/কৃষক সদস্য রয়েছে। যে কোন একটি সিআইজি-এর এই ৩০ জন সদস্যকে একত্রে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীরা সুনির্দিষ্ট ফরমে নিজেদের নাম নিবন্ধন করবেন। এ জন্য প্রশিক্ষণ শুরুর আগে প্রশিক্ষণ সংগঠক (Training Organizer) নাম নিবন্ধন এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

প্রশিক্ষণের জন্য অভীষ্ট দল ঃ ৩০ জন সিআইজি খামারী/কৃষক সদস্য।

নাম নিবন্ধন এর লক্ষ্য ঃ

আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন করা যাতে প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী ও আমন্ত্রিত অতিথিদের মাঝে পরিচিতি ঘটে এবং কোর্স সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী ঃ

ব্যানার, নিবন্ধন ফরম, প্রশিক্ষণ সামগ্রী, ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন ঃ

- প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন অনুষ্ঠান শুরুর আগে সকল প্রশিক্ষণার্থী ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের আসন গ্রহন।
- প্রশিক্ষণ সংগঠক/ইউএলও উদ্বোধন অনুষ্ঠান এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করতে পারেন।
- সভাপতির অনুমতিক্রমে যথানিয়মে প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন অনুষ্ঠান শুরুকরণ।

কোর্স উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণ সংগঠক যা আলোচনা করবেন ঃ

১. প্রশিক্ষণ শুরু করার সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্রশিক্ষণ সংগঠক উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদানের জন্য আহ্বান জানাবেন। এ পর্যায়ে সিআইজি সদস্যগণ নিজের নাম ও কোন গ্রাম থেকে এসেছেন জানিয়ে পরিচিত হবেন।

২. পরিচিতি পর্ব শেষে প্রশিক্ষণ সংগঠক তাঁর স্বাগত বক্তব্য প্রদান ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করবেন। তিনি বক্তব্য প্রদানের সময় সংক্ষিপ্তভাবে এনএটিপি-২ সর্ম্পকে সকলকে অবহিত করবেন।

- বাংলাদেশ সরকার, বিশ্ব ব্যাংক, ইফাদ ও ইউএসএআইডি এর আর্থিক সহায়তায় বর্তমানে দেশের ৫৭টি জেলার ২৭০টি উপজেলায় ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম - ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- এনএটিপি-২ এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে - প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র খামারী/কৃষকদের খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উপাদিত পণ্যের ন্যায্য বাজারমূল্য প্রাপ্তিতে বাজারে প্রবেশাধিকারে তাঁদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
- উক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রাণিসম্পদ, কৃষি ও মৎস্য অধিদপ্তরের যৌথ পরিচালনায় প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- এ জন্য প্রতি ইউনিয়ন পরিষদের নির্মীত ভবনে দুইটি কক্ষ নিয়ে FIAC গঠন করা হচ্ছে। এ পর্যায়ে FIAC সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া যেতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন এর CEAL-কে উপস্থিত সিআইজি সদস্যগণের সংঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সমাপ্তি করণ ঃ

- উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে এক জনকে এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্য থেকে এক জনকে বক্তব্য প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।
- সিআইজি সদস্যদেরকে অত্র প্রশিক্ষণে সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান ও প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে খামারের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উদ্বুদ্ধ পূর্বক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সমাপ্তিকরণ।

১ম সেশন ঃ

দারিদ্র বিমোচনে ছাগল পালন, ছাগলের উন্নত জাত নির্বাচন ও ছাগল পালনের বিভিন্ন পালন পদ্ধতি সেশনে যা আলোচনা করা হবে ঃ

দারিদ্র বিমোচনে ছাগল পালন ঃ

- বাংলাদেশে ছাগল পালন লাভজনক, বিশেষ করে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ।
- এদের বাচ্চা উৎপাদন ক্ষমতা অধিক এবং দেশীয় জলবায়ুতে বিশেষভাবে উৎপাদন উপযোগী।
- এ দেশে প্রাপ্ত ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল দ্রুত প্রজননশীল। প্রতি বছর এরা দু'বার করে বাচ্চা দেয় এবং প্রতিবারে সাধারণত দু'টি করে বাচ্চা দেয়।
- দ্রুত প্রজননশীলতা, উন্নত মাংশ ও চামড়ার জন্য ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত।
- আমাদের দেশে ছাগল পালনে নানাবিধ সুবিধা রয়েছে। ছাগলের জন্য বড় পশুর মত চারণভূমির প্রয়োজন হয় না। খেতের আইলে, রাস্তার ধারে বাড়ির আশ-পাশের জায়গায় ঘাস, লতা, গুল্ম খেয়ে এরা জীবন ধারণ করতে পারে। ছাগলের জন্য গরু-মহিষের মত অধিক খাদ্য, উন্নত বাসস্থান বা বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয় না।
- গবাদিপ্রাণির অন্যান্য জাতের তুলনায় ছাগলের রোগবালাই কম।
- ছাগলের দুধ সহজে হজম হয় এবং যক্ষা রোগের জীবানু মুক্ত। তা ছাড়া হাঁপানি রোগের ঔষধ হিসাবে ছাগলের দুধ বিবেচিত হয়।
- ছোট প্রাণি বলে ছাগলের দাম কম। ফলে অল্প পুঁজিতে অল্প জায়গায় কয়েকটি ছাগল পালন করা যায়।
- স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে দু'চারটি ছাগল পালন করে পড়াশুনার খরচ চালাতে পারে।

- ছাগল পালন করে একজন ভূমিহীন বা প্রান্তিক খামারী সহজেই বাড়তি আয় করে দারিদ্র বিমোচনে অবদান রাখতে পারেন।

উন্নত জাতের ছাগল নির্বাচন

- উন্নত জাতের ছাগল এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
  - **১.** ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল
  - **২.** যমুনাপারী জাতের ছাগল
  - **৩.** বিটাল জাতের ছাগল

১. ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ঃ

- ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল বাংলাদেশের প্রধান জাতের ছাগল ।
- এ জাতের ছাগলকে কালো ছাগল বলা হলেও এদের গায়ের রং কালো ছাড়াও বাদামী, সাদা ও সাদা কালো মিশ্রিত হতে দেখা যায়।
- এদের কান সোজা ও খাড়া কিন্তু শিং বাঁকানো থাকে। এরা আকারে তুলনামূলক ছোট হয়।
- এ জাতের ছাগল দ্রুত প্রজননশীল।
- স্ত্রী ছাগল ৯-১০ মাস বয়সে প্রথম প্রজননক্ষম ও ১৪-১৫ মাস বয়সে প্রথম বাচচা প্রসব করে। সাধারণত প্রথম বারে ১টি এবং পরবর্তি প্রজননে ২-৩টি করে বাচ্চা দিয়ে থাকে।
- এ জাতের ছাগল বছরে দু'বার গর্ভধারণ ও প্রতিবারে ১-২টি বাচ্চা প্রসব করে। তবে কখনও কখনও ৩-৪টি পর্যন্ত বাচ্চা প্রসব করতে দেখা যায়।
- এ জাতের ছাগী দুধ দেয় খুব কম। এমকি দুই এর অধিক বাচ্চা হলে দুধের ঘাটতি হয়। তবে উপযুক্ত খাদ্য ব্যবস্থাপনায় অনেক ছাগী দৈনিক ১-১.৫ লিটার দুধ দেয় এবং দুধ প্রদান কাল ২-৩ মাস।
- পূর্ণবয়স্ক একটি স্ত্রী ছাগলের ওজন ১৫-২০ কেজি এবং পূর্ণবয়স্ক একটি পুরুষ ছাগলের ওজন ২৫-৩০ কেজি হয়ে থাকে।
- এ জাতের ছাগলের মাংস উন্নত, অত্যন্ত সুস্বাধু ও জনপ্রিয় মাংশ। সাধারণত ২০ কেজি ওজনের খাসী থেকে কমপক্ষে ১১ কেজি মাংশ পাওয়া যায়।
- ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়ার মান অনেক উন্নত, তাই বিশ্বব্যাপী এর চামড়ার চাহিদাও বেশী।
- ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল অত্যাধিক কষ্টসহিষ্ণু।

২. যমুনাপারী জাতের ছাগলঃ

- এ জাতের ছাগলের উৎপত্তি মূলত ভারত। তবে বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে এ জাতের ছাগল কিছু কিছু পালন করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে এ জাতের ছাগল রাম ছাগল নামে পরিচিত।
- এদের শারীরিক রং কালো, বাদামী, সাদা বা বিভিন্ন রঙের সংমিশ্রণে হয়ে থাকে।
- যমুনাপারী জাতের ছাগলের পা খুব লম্বা এবং কান লম্বা ও ঝুলানো থাকে।
- শরীরের লোম লম্বা হয়। পিছনের পায়ের লোম বেশী লম্বা থাকে।
- এরা আকারে বেশ বড় হয়।
- পূর্ণবয়স্ক একটি পুরুষ ছাগলের ওজন ৭০-৭৫ কেজি এবং পূর্ণবয়স্ক একটি স্ত্রী ছাগলের ওজন ৫০-৬০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে।
- তবে এদের চামড়া এবং মাংস তত উন্নত নয়।

- স্ত্রী ছাগল বছরে একটি করে বাচ্চা দেয়।
- এদের দুধ উৎপাদন বেশি। একটি ছাগী প্রতিদিন ২-৩ লিটার পর্যন্ত দুধ দিতে পারে।
- এ জাতের ছাগল আবদ্ধ অবস্থায় বা খামারে পালনের জন্য উপযোগী।

৩. বিটল জাতের ছাগলঃ

- জাতের ছাগলের উৎপত্তি পাকিস্তান ও ভারতে। বাংলাদেশের অল্প কিছু এলাকায় ও এ জাতের ছাগল পালন করা হয়ে থাকে।
- এরা কালো, সাদা, বাদামী বা কালো ও বাদামীর মধ্যে সাদা ফুটফুটে হয়ে থাকে।
- এদের কান বড় ও ঝুলানো অনেকটা যমুনাপারী ছাগলের মত।
- এদের শিং পিছনের দিকে বাঁকানো থাকে।
- এরা আকারে বেশ বড় হয় এবং পা লম্বা হয়।
- একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ছাগলের ওজন ৬০-৭০ কেজি এবং একটি পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী ছাগলের ওজন ৪০-৫০ কেজি হয়ে থাকে।
- এদের দুধ উৎপাদন ছাগলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। একটি ছাগী দৈনিক ৪-৫ লিটার দুধ দেয়।

ছাগলের বিভিন্ন পালন পদ্ধতি ঃ

সাধারণত ৪ ধরণের পদ্ধতিতে ছাগল পালন করা যেতে পারে ঃ

১. অঙ্গিনায় বা মাঠে ছেড়ে বা মাঠে বেঁধে ছাগল পালন (পারিবারিকভাবে ছাগল পালন)।
২. মুক্তভাবে ছাগল পালন।
৩. আধা নিবিড় (সেমি-ইন্টেনসিভ) পদ্ধতিতে ছাগল খামার।
৪. নিবিড় (ইন্টেনসিভ) পদ্ধতিতে ছাগল খামার।

১. অঙ্গিনায় বা মাঠে ছেড়ে বা মাঠে বেঁধে পালন (পারিবারিকভাবে ছাগল পালন)

- পারিবারিকভাবে ছাগল পালনের জন্য ২-৫ টি ছাগল রাখা হয়।
- এ পদ্ধতিতে ছাগল পালন সহজ ও খরচ নাই বল্লেই চলে।
- সাধারণত এ পদ্ধতিতে ছাগল পালনে বাসস্থানে বাড়তি কোন ঘাস সরবরাহ করা হয় না।
- সে জন্য পৃথক কোন আবাসনের প্রয়োজন হয়না।
- আমাদের দেশে বেশীরভাগ কৃষক এ পদ্ধতিতে ছাগল মাঠে ছেড়ে বা মাঠে বেঁধে ঘাষ খাওয়ান।
- এ পদ্ধতিতে ছাগল পালন করতে বাড়তি কোন লোকবলের প্রয়োজন হয় না।
- তবে মাঠে ছেড়ে ছাগল পালন করলে অনেক ক্ষেত্রে ফসলের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।
- ভাল উৎপাদন এর জন্য এদেরকে দানাদার খাদ্যে সরবরাহ করতে হয়।

২. মুক্তভাবে ছাগল পালন

- এই জাতীয় খামারে সাধারণত ৮-১০ টি ছাগল পালন করা হয়।
- চাষাবাদের অনুপযোগী উচু জমি যেমন পাহাড়, পুকুর পাড়, রাস্তার ধারে, অথবা চর এলাকায় পতিত ভূমিতে এদেরকে দিনে মাঠে চড়িয়ে সন্ধায় বাড়িতে এনে চারিদিকে বেড়া/ঘেরাও দিয়ে রাখা হয়।
- সাধারণত এ পদ্ধতিতে ছাগল পালনে বাসস্থানে বাড়তি কোন ঘাস সরবরাহ করা হয় না।
- তাই এ পদ্ধতিতে ছাগল পালন করতে আলাদা করে ঘাষ চাষের প্রয়োজন হয় না।

- এদেরকে রাতে দানাদার খাদ্যে সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হয়।
- এ পদ্ধতিতে ছাগল পালনে কমপক্ষে এক জন লোকের প্রয়োজন।
- চর এলাকায় এ পদ্ধতিতে ছাগল খামার করা লাভজনক।
- চর এলাকায় ছাগল চড়ে-বেড়ানোর জন্য অনেক যায়গা পায়, এখানে রোগবালাই কম, তাই খাদ্য ও রক্ষনাবেক্ষণ খরচও অন্যান্য স্থান থেকে তুলনামূলকভাবে কম হয়।
- বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে চর এলাকা ছাড়া দেশের অধিকাংশ স্থানেই এ পদ্ধতিতে ছাগল পালন করা প্রায় অসম্ভব।

৩. আধা নিবিড় (সেমি-ইন্টেনসিভ) পদ্ধতিতে ছাগল খামার

- এই জাতীয় খামারে সাধারণত একসাথে ১৫-২০টি বা আরো বেশী সংখ্যক ছাগল পালন করা হয়।
- মুক্তভাবে ছাগল পালনের মত এ পদ্ধতিতেও দিনের বেলায় ছাগলকে মাঠে চড়ানো হয় এবং রাতে বাড়িতে এনে আবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়।
- এদেরকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করার জন্য সম্পূরক খাদ্য হিসাবে ঘাস ও দানাদার খাদ্য দেয় হয়।
- এ পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ছাগল পালন করা হয় বিধায় ছাগলের পুষ্টি, প্রজনন ও স্বাস্থ্য বিষয়ে যথাযথ যত্ন নেয়া সম্ভব হয়।
- এ পদ্ধতিতে ছাগলের উৎপাদন আশানুরূপ হয়।
- বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাণিজ্যিকভাবে ছাগল পালনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী। তবে এ ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ ও বিনিয়োগ তুলনামূলকভাবে একটু বেশী।
- একসাথে অধিক সংখ্যক ছাগল একত্রে থাকে বিধায় বিভিন্ন ছোঁয়াচে রোগ যেমন- চর্ম রোগ, একথাইমা, ডায়েরিয়া ইত্যাদি রোগের প্রকোপ বেশী দিতে পারে।

৪. নিবিড় (ইন্টেনসিভ) পদ্ধতিতে ছাগল খামার

- এই জাতীয় খামারে আবদ্ধ অবস্থায় ছাগল পালন করা হয়, তাই খামারের সেড ও ব্যবস্থাপনার সুযোগ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাগল পালন করা হয়।
- এ পদ্ধতিতে ছাগলের সেডে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার ঘাস ও দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা হয়
- ঘাস সরবরাহের জন্য খামারে উচ্চ ফলনশীল প্রয়োজনীয় ঘাস চাষ করা হয়।
- এখানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ছাগল পালন করা হয় বিধায় ছাগলের পুষ্টি, প্রজনন ও স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষ যত্ন নেয়া সম্ভব হয়।
- অল্প জায়গায় অধিক সংখ্যক ছাগল পালন করা যায়। তবে খামারের প্রাথমিক বিনিয়োগ ও উৎপাদন খরচ তুলনামূলকভঅবে বেশী হয়।
- একসাথে অধিক সংখ্যক ছাগল একত্রে থাকে বিধায় বিভিন্ন ছোঁয়াচে রোগ যেমন- চর্ম রোগ, একথাইমা, ডায়েরিয়া ইত্যাদি রোগের প্রকোপ বেশী দেখা দিতে পারে।
- আমাদের দেশের ছাগল সাধারণত আবদ্ধ আবস্থায় থাকতে পছন্দ করে না তাই ছাগল সংগ্রহের সাথে সাথেই সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় রাখা উচিত নয়।
- প্রথমে ছাগলকে দিয়ে ৬-৮ ঘন্টা চরিয়ে বাকি সময় আবদ্ধ অবস্থায় রেখে পর্যাপ্ত খাদ্য (ঘাস ও দানাদার খাদ্য) সরবরাহ করতে হবে।
- এভাবে ১-২ সপ্তাহের মধ্যে চরানোর সময় পর্যায়ক্রমে কমিয়ে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় রাখতে হবে।
- তবে বাচ্চা বয়স থেকে আবদ্ধ অবস্থায় রাখলে এ ধরণের অভ্যস্থতার প্রয়োজন নেই।

২য় সেশন ঃ

ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা সেশনে যা আলোচনা করা হবে ঃ

আমাদের দেশের ছাগলকে সাধারণত ছেড়ে পালা হয় এবং এদের স্বাস্থ্য ও খাদ্য ব্যবস্থাপনায় তেমন কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না। ফলে এদের নিকট থেকে আশানুরূপ উৎপাদনও পাওয়া যায় না। অথচ ছাগলকে পর্যাপ্ত কাঁচা ঘাস, পরিমিত প্রক্রিয়াজাত খড়, দানাদার খাদ্য, পর্যাপ্ত পরিমানে পরিস্কার পানি সরবরাহ এবং গরু-ভেড়া থেকে পৃথক আবাসন ব্যবস্থা, নিয়মিত কৃমিনাশক চিকিৎসা ও টিকা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হলে এদের উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি করা যায়।

খাদ্য উপকরণে যে পুষ্টি উপাদান অধিক পরিমানে থাকে তাকে সে জাতীয় খাদ্য বলে। যেমন-

- শর্করা জাতীয় খাদ্য (ভুট্টা, গম, কাওন, চাউলের কুঁড়া, গমের ভুষি, ইত্যাদি)।
- আমিষ জাতীয় খাদ্য (সয়াবিন মিল, তিলখৈল, শুটকিমাছ, মিটমিল, ইত্যাদি)।
- চর্বি জাতীয় খাদ্য (এনিমেল ফ্যাট , ভেজিটেবল অয়েল, সার্কলিভার ওয়েল, ইত্যাদি)।
- ভিটমিন জাতীয় খাদ্য (শাকসব্জি ও কৃত্রিম ভিটামিন)
- খনিজ জাতীয় খাদ্য (ঝিনুক , ক্যালশিয়াম ফসফেট, রকসল্ট, লবন, ইত্যাদি)।
- পানি ঃ দেহ কোষে শতকরা ৬০- ৭০ ভাগ পানি থাকে। তাই কোন প্রাণী খাদ্য না খেয়েও কিছু দিন বাঁচতে পারে, কিন্তু পানি ছাড়া সামান্য কিছু দিনের বেশী বাঁচে না।
    - সাধারণত দেহ থেকে পানির ক্ষয় হয় মলমূত্র ও শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে ।
    - অপরদিকে পানি আহরিত হয় পানি পান করে, রসালো খাদ্য গ্রহণ করে এবং দেহের ভিতর বিভিন্ন পুষ্টি উপদানের অক্সিডেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।
    - দেহের বেশির ভাগ অংশ পানি দ্বারা গঠিত।
    - প্রাণির দেহে পানির কাজ ঃ
        - খাদ্যতন্ত্রের মধ্যে খাদ্য বস্তু নরম ও পরিপাকে সাহায্য করে।
        - খাদ্যতন্ত্রের মধ্যে পুষ্টি উপাদান তরল করে দেহের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিবহণ করে।
        - দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে ও দেহকে সতেজ রাখে।
        - দেহের ভিত্তিতে দুষিত পদার্থ অপসারণ করে।
        - দেহের গ্রন্থি হতে নিঃসৃত রস, হরমোন,এনজাইম এবং রক্ত গঠনে ভূমিকা রাখে।

প্রাণির খাদ্যকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন -

১. আঁশ বা ছোবড়া জাতীয় খাদ্য, যেমন ঃ খড় , সবুজ ঘাষ বা কাঁচা ঘাষ, ইত্যাদি।
২. দানাদার জাতীয় খাদ্য, যেমন ঃ চালের কুঁড়া, গমের ভূষি, চাউলের ক্ষুদ, খেসারি ভাঙ্গা, তিল বা বাদাম খৈল, ইত্যাদি।
৩. সহযোগী অন্যান্য খাদ্য যেমন ঃ খনিজ উপাদান, ভিটামিন ইত্যাদি।

- সাধারণত ১৫-২০ কেজি ওজনের বয়স্ক ছাগলের জন্য দৈনিক ১.৫-২.০ কেজি সবুজ/কাঁচা ঘাষ খাওয়ানোর প্রয়োজন।
- চারণভূমিতে ঘাসের পরিমান কম হলে ছাগল প্রতি দৈনিক ০.৫-১.০ কেজি কাঁঠাল পাতা, ইপিল ইপিল পাতা, বাবলা পাতা, ইত্যাদি দিতে হবে।
- প্রতিটি ছাগলকে দৈনিক ২৫০-৩০০ গ্রাম মিশ্রিত দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
- ছাগলকে দানাদার খাদ্য হিসাবে সাধারণতঃ চাল, গম, ভূট্টা ভংগা, চালের কুড়া, গমের ভূষি, মাসকলাই/খেসারী কলাই, ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়।

- ছাগলকে প্রচুর পরিমানে বিশুদ্ধ পানি খাওয়ানোর উপকারিতা।
- এক কেজি মিশ্রিত দানাদার খাদ্য প্রস্তুতে বিভিন্ন উপাদনের পরিমান
    - গম/ভূট্টা/চাল ভাঙ্গা ৩০০ গ্রাম
    - চালের কুড়া ৩০০ গ্রাম
    - ডালের ভূষি/গমের ভূষি ২০০ গ্রাম
    - খৈল (তিল/সোয়বিন/সরিষা) ১৫০ গ্রাম
    - ঝিনুক গুড়া ২০ গ্রাম
    - লবণ ৩০ গ্রাম

    মোট = ১০০০ গ্রাম

- উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ছাগলকে ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় প্রক্রিয়াজাত করে খাওয়ানো প্রয়োজন।
- ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় প্রক্রিয়াজাত করতে বিভিন্ন উপকরণের পরিমান -
    - ২-৩ ইঞ্চ করে কাঁটা খড় ১ কেজি
    - চিটাগুড় ২২০ গ্রাম
    - ইউরিয়া ৩০ গ্রাম
    - পানি ৬০০ মি.লি

কিভাবে ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় (ইউ.এম.এস) প্রক্রিয়াজাত করণ করতে হবে ঃ

ইউ.এম.এস তৈরীর প্রথম শর্ত হল এর উপাদানগুলির অনুপাত সর্বদা সঠিক রাখতে হবে অর্থাৎ ১০০ ভাগ ইউ.এম.এস এর শুষ্ক পদার্থের মধ্যে ৮২ ভাগ খড়, ১৫ ভাগ মোলাসেস এবং ৩ ভাগ ইউরিয়া থাকতে হবে। খড় ভিজা বা মোলাসেস পাতলা হলে উভয়ের পরিমাণই বাড়িয়ে দিতে হবে। প্রথমে খড়, মোলাসেস ও ইউরিয়ার পরিমাণ মেপে নিতে হবে। এর পর পানিতে ইউরিয়া ও চিটাগুড় মিশিয়ে উহা ভালভাবে খড়ের সাথে মিশাতে হবে। পানি বেশী হলে দ্রবণটুকু খড় চুষে নিতে পারবে না আবার কম হলে দ্রবণ ছিটানো সমস্যা হবে। শুকনো খড়কে পলিথিন বিছানো বা পাকা মেঝেতে সমভাবে বিছিয়ে ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবণটি আস্তে অস্তে ঝরণা বা হাত দিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে,এবং সাথে সাথে খড়কে উল্টিয়ে দিতে হবে যাতে খড় দ্রবণ চুষে নেয় ।

এ ভাবে স্তরে স্তরে খড় সাজাতে হবে এবং ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবণ সমভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। ওজন করা খড়ের সাথে পুরো দ্রবণ মিশিয়ে নিলেই ইউ.এম.এস প্রাণিকে খাওয়ানোর উপযুক্ত হয়। প্রস্তুতকৃত ইউরিয়া মোলাসেস খড় সঙ্গে সঙ্গে ছাগলকে খাওয়ানো যায় অথবা একবারে ২/৩ দিনের তৈরী খড় সংরক্ষণ করে আস্তে আস্তে খাওয়ানো যায়। তবে কোন অবস্থাতেই খড় বানিয়ে তিন দিনের বেশী রাখা উচিৎ নয়। কারণ তাতে খড়ে ইউরিয়া এবং মোলাসেস এর পরিমাণ কমতে থাকবে। একটি প্রাপ্ত বয়স্ক ছাগলকে দৈনিক ৫০০-৮০০ গ্রাম পর্যন্ত ইউরিয়া-মোলাসেস প্রক্রিয়াজাত খড় খাওয়ানো যেতে পারে। তবে ছাগলকে প্রথম অবস্থাতেই উক্ত প্রক্রিয়াজাত খাদ্য একাবারে দেয়া যাবে না। প্রাথমিকভাবে দৈনিক অল্প অল্প করে প্রক্রিয়াজাত খড় সরবরাহ করে ৩/৪ দিনের মধ্যে উক্ত খাদ্য খাওয়ানোর অভাস করাতে হবে। এর পর থেকে ছাগলকে দৈনিক পূর্ণ মাত্রায় প্রক্রিয়াজাত খড় খাওয়ানো যেতে পারে।

প্রাণিকে ইউ.এম.এস খাওয়ালে সুবিধা ঃ

- ইউ.এম.এস ৬ মাসের উর্দ্ধে ছাগল থেকে শুরু করে সকল বয়সের ছাগলকে তাদের চাহিদা মত খাওয়ানো যায়।

- শুধু ইউ.এম.এস খাওয়ালেও ছাগলের ওজন বৃদ্ধি পায়।
- ইউ.এম.এস তৈরীর পদ্ধতি সহজ। একজন শ্রমিক প্রায় ৫০০-৬০০ কেজি খড় তৈরী করতে পারেন।
- যেহেতু ইউরিয়া ও মোলাসেস খড়ের সাথে ধীরে ধীরে খাচ্ছে, তাই প্রাণির বিষক্রিয়া হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।
- কৃষক তার দৈনিক চাহিদা মত খড় প্রস্তুত করে প্রতিদিন খাওয়াতে পারেন। তবে প্রক্রিয়াজাত খড় তিন দিনের বেশী সংরক্ষণ করে রাখা যাবে না। কেননা তিন দিনের বেশী সংরক্ষণ করলে উহার গুণগত মান কমে যাবে।

প্রাণিকে ইউ.এম.এস খাওয়ালে অসুবিধা

- ইউ.এম.এস পদ্ধতিতে ইউরিয়া মোলাসেস খাওয়ানোর তেমন কোন অসুবিধা নেই। তবে ছয় মাসের কম বয়সের ছাগলকে ইউ.এম.এস খাওয়ানো যাবে না।

প্রাণিকে ইউ.এম.এস খাওয়াতে সাবধনতা অবলম্বন ঃ

- ইউ.এম.এস তৈরী করার সময় অবশ্যই ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় ও পানির অনুপাত ঠিক রাখতে হবে।
- ইউরিয়ার মাত্রা কোন অবস্থাতেই বাড়ানো যাবে না। ইউ.এম.এস এর গঠন পরিবর্তন করলে কাংখিত ফল পাওয়া যাবে না।

ছাগলের জন্য ঘাস চাষ ঃ

- ঘাস সরবরাহের জন্য বিভিন্ন জাতের দেশী ঘাস খাওয়ানো যায়।
- ইপিল ইপিল, কাঁঠাল পাতা, খেসারী, মাসকলাই, দুর্বা, বাকসা ইত্যাদি দেশী ঘাসগুলো বেশ পুষ্টিকর।
- উচ্চ ফলনশীণ নেপিয়ার, স্পেনাড্ডিা, এন্ড্রো পোগন, পিকাটুইস ইত্যাদি ঘাস আবাদ করা যেতে পারে।

৩য় সেশন

ছাগলের বাসস্থান ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সেশনে যা আলোচনা করা হবে ঃ

ছাগলের রোগ বালাই কম হলেও ছাগল একটি তাপ সংবেদনশীল প্রাণী। অল্পতেই এদের ঠান্ডাজনিত অসুখ হতে পারে। তাই ছাগলের বাসস্থান এর বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হতে হবে।

ছাগলের বাসস্থান ঃ

- ছাগলের জন্য মাচার ঘর সবসময়েই অধিক উপযোগী।
- ছাগলেরর ঘর শুষ্ক, উচু ও পানি জমে না এরূপ স্থানে নির্মাণ করা প্রয়োজন।
- ঘরে প্রচুর আলো বাতাসের ব্যবস্থা ও ঘরের মেঝে সবসময়ে শুষ্ক ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি এবং দক্ষিণ দিক খোলা স্থানে ছাগলের ঘর নির্মাণ করতে হবে।
- বাসস্থানের অন্য তিন দিকে ঘেরা পরিবেশ থাকবে যেখানে কাঁঠাল, ইপিল ইপিল গাছ বা ছাগলকে গাছের পাতা খাওয়ানো যায় এমন ধরণের গাছ লাগাতে হবে।
- একটি পূর্ণ বয়স্ক ছাগলের জন্য ১.০ থেকে ১.৫ বর্গ মিটার বা ১০ থেকে ১৫ বর্গ ফুট এবং বাড়ন্ত বাচ্চার জন্য ০.৩ থেকে ০.৮ বর্গ মিটার বা ৩ থেকে ৮ বর্গ ফুট জায়গা প্রয়োজন।
- মাচায় ছাগলের ঘর র্নিমান ঃ
    - ছাগলের ঘরের ভিতর বাঁশ বা কাঠের মাচা তৈরি করে তার উপর ছাগল রাখতে হবে।
    - ছাগলের ঘরের মাচার উচ্চতা ১.০০ মিটার বা ৩.৩৩ ফুট এবং মাচা থেকে ছাদের উচ্চতা ১.৮-২.৪ মিটার বা ৬-৮ ফুট হবে।
    - গোবর ও চনা পড়ার জন্য ছাগলের ঘরের মেঝেতে বাঁশের চটা বা কাঠকে ১ সে.মি. ফাকা রাখতে হবে।

- মাচার নিচ থেকে সহজে গোবর ও চনা সরানোর জন্য ঘরের মাঝ বরাবর উঁচু থাকবে যাতে দুই পার্শে ঢালু রাখা যায়।
- ঘরের মেঝে মাটির হলে সেখানে পর্যাপ্ত বালি মাটি দিতে হবে।
- বৃষ্টিতে ছাগলের ঘর যাতে সরাসরি না ঢোকে সে ব্যবস্থা নিতে হবে।
- শীত কালে রাতের বেলায় মাচার উপরের দেয়ালকে চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যেন ছাগলের ঠান্ডা না লাগে।

ছাগলের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় যে সকল বিষয়ে আলোচনা করতে হবে ঃ

ছাগলের সুস্থতার লক্ষণ

- ছাগল দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করবে। কোন ছাগল অসুস্থ হলে সেটি দল থেকে সরে ধীরে ধীরে চলে বা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।
- সুস্থ ছাগল এক মনে খাদ্য গ্রহণ করে।
- সুস্থ ছাগলের মাথা শরীরের সাথে সমান্তরালভাবে থাকে এবং সবসময়ে সাবলীল ভঙ্গিতে চলাফেরা করে।
- ছাগলের নাক ও চোখ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে, অর্থাৎ এতে কোন ময়লা লেগে থাকবে না।
- সুস্থ ছাগল কোন রকম খুঁড়িয়ে হাটবে না।
- সুস্থ ছাগলের পায়খানা দানাদার হবে এবং পায়ুপথ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে।
- দুধের বাঁট এবং ওলান নরম ও স্পঞ্জের মত থাকবে, কোন প্রকার দানা বা শক্ত কিছু থাকবে না।
- ছাগলের কাছে কোন আগন্তক এলে সুস্থ ছাগল সাবলীল ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে তাকাবে এবং কিছুক্ষণ পর পুণরায় খাদ্য গ্রহন শুরু করবে।

ছাগলের নিম্নে বর্ণিত রোগের লক্ষণ ও প্রতিকার সর্ম্পকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে হবে -

- ❖ পিপিআর
- ❖ গোট পক্স
- ❖ একথাইমা
- ❖ তড়কা
- ❖ নিউমোনিয়া
- ❖ কৃমি

আমাদের দেশে ছাগল মূলত পিপিআর, নিউমোনিয়া ও কৃমিতে বেশী আক্রান্ত হয়। এ সর্ম্পকে আলোচনা ঃ

ছাগলের পিপিআর ঃ

রোগের উৎস ঃ - অসুস্থ পশুর সংস্পর্শে পিপিআর হতে পারে।

রোগের লক্ষণ ঃ - পিপিআর রোগ হলে ছাগল পিঠ বাঁকা করে দাঁড়িয়ে থাকে।
- নাক, মুখ ও চোখ দিয়ে তরল পদার্থ বের হতে থাকে।
- শরীরের তাপ বেড়ে যায় এবং পাতলা পায়খানা হয়।

চিকিৎসা ঃ - এ রোগের চিকিৎসায় ভাল ফল পাওয়া যায় না।
- তবে পানি স্বল্পতা পূরণের জন্য স্যালাইন খাওয়াতে হবে।
- ছাগলের পাঁচ মাস বয়সে পিপিআর টীকা দিতে হবে।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তিন বৎসর পর্যন্ত কার্যকর থাকে।

ছাগলের নিউমোনিয়া ঃ

রোগের উৎস ঃ - সাধারণত বর্ষাকাল ও স্যাঁত স্যাঁতে আবহওয়ায় এ রোগ হতে দেখা যায় ।

রোগের লক্ষণ ঃ - ছাগলের এ রোগ হলে প্রথমে ঠান্ডা ও পরে জ্বর হবে।

- নাক দিয়ে শ্লেষ্মা বের হতে থাকে।
- শরীরের তাপ বেড়ে যাবে এবং ঘন শ্লেষ্মা হওয়ায় শ্বাস ফেলতে কষ্ট হবে।

চিকিৎসা ঃ - এ রোগ চিকিৎসায় ভাল ফল পাওয়া যায়।

- পরিস্কার, শুষ্ক, মুক্ত বায়ু চলাচল উপযোগি বাসস্থান হতে হবে।
- ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে।

ছাগলের কৃমি রোগ ঃ

রোগের উৎস ঃ - চারণ ভূমি, খাদ্য এবং পানির মাধ্যমে কৃমি রোগ বিস্তার লাভ করে।

রোগের লক্ষণ ঃ - ছাগলের এ রোগ হলে স্বাস্থ্যহানি হয়।

- শরির দূর্বল ও রক্ত স্বল্পতা দেখা দেবে।
- প্রজনন কম বা বিলম্ব হবে।
- ছাগলের ডায়রিয়া হতে পারে।

চিকিৎসা ঃ - এ রোগ চিকিৎসায় ভাল ফল পাওয়া যায়।

- পরিস্কার, শুষ্ক, মুক্ত বায়ু চলাচল উপযোগি বাসস্থান হতে হবে।
- ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী কৃমিনাশক চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- বছরে দুবার বর্ষার প্রারম্ভে (এপ্রিল-মে) কৃমি নাশক এবং বর্ষার শেষে (অক্টোবর-নভেম্বর) ব্রডস্ট্রোকট্রাম কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে।

ছাগলের রোগ প্রতিকারে নিম্নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন ঃ

- ছাগলের সংক্রামক রোগের টিকা প্রদান-
  - স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে সুস্থ ছাগলের জন্য একথাইমা রোগের ভ্যাকসিন জন্মের ৩য় দিন ১ম ডোজ এবং ২য় ডোজ জন্মের ১৫-২০ দিন পর দিতে হবে।
  - ৩ মাস বয়সে ছাগলকে ক্ষুরা রোগের টিকা দিতে হবে।
  - ৪ মাস বয়সে পিপিআর রোগের ভ্যাকসিন দিতে হবে।
  - গোট পক্সের ভ্যাকসিন ৫ মাস বয়সে দিতে হবে।
- খামারে কোন নতুন ছাগল আনতে হলে অবশ্যই রোগমুক্ত ছাগল সংগ্রহ করতে হবে এবং ১৫ দিন খামার থেকে দূরে অন্যত্র রেখে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- কোন রোগ দেখা না দিলে ১৫ দিন পর পিপিআর ভ্যাকসিন দিয়ে ছাগল খামারে নেয়া যাবে।
- অসুস্থ ছাগল পালের অন্য ছাগল থেকে দ্রুত অন্যত্র সরিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে।
- কোন ছাগলের চর্মরোগ দেখা দিলে তা ফার্ম থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে,
- ছাগলের ঘর নিয়মিত পরিস্কার করতে হবে।
- প্রাণির চিকিৎসা সেবা গ্রহনের জন্য যথাসময়ে ইউনিয়ন পরিষদে অবস্থিত FIAC এ গিয়ে সিল (CEAL) এর সহায়তা অথরা উপজেলা ভেটেরিনারি হাসপাতালে গিয়ে Veterinary Doctor এর পরামর্শ নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৪র্থ সেশন

ছাগল প্রজনন, পাঠা পালন, দুগ্ধবতী ও গর্ভবতী ছাগীর এবং নবজাত ছাগলের বাচ্চার পরিচর্যা সেশনে যা আলোচনা করা হবে ঃ

ছাগলের প্রজনন ব্যবস্থাপনা ঃ

- বাড়ন্ত ছাগী ৫-৬ মাস বয়সে প্রথম গরম হয়, এ বয়সে তাকে পাল না দেয়াই ভাল।
- প্রজননের জন্য ছাগীর বয়স ৭-৮ মাস এবং ওজন ১২-১৩ কেজি হওয়া প্রয়োজন।
- ছাগী গরম হওয়ার লক্ষণ - মিউকাস নিঃসরণ, ডাকাডাকি করা, অন্য ছাগীর উপর উঠা, ইত্যাদি
- প্রজননের সময় কম বয়সের পাঠীকে কম বয়সের পাঠার সাথে পাল দেয়া ঠিক নয়। কেননা এ ধরণের ছাগলকে যদি পাল দেয়া হয় তখন উক্ত ছাগলের বাচ্চার মৃত্যুর হার বেশী হবে।
- ছাগল গরম হওয়ার লক্ষণ ও প্রজননের উপযুক্ত সময় - ছাগী গরম হওয়ার ১২-১৪ ঘন্টা পর পাল দিতে হয়, অর্থ্যাৎ সকালে গরম হলে বিকেলে এবং বিকেলে হলে পরদিন সকালে পাল দিতে হবে।
- ছাগী সাধারণত পাল দেওয়ার ১৪২-১৫৮ দিনের মধ্যে বাচ্চা দেয়।
- ছাগী বাচ্চা দেয়ার ২০-৩০দিনের মধ্যে পুনরায় গরম হয়। অনেক ক্ষেত্রে বাচ্চা দেয়ার ৯-১২ দিনের মধ্যেও ছাগী গরম হতে পারে। তবে এ সময়ে ছাগীকে পাল দেয়া ঠিক হবে না। বাচ্চা দেয়ার ১.৫-২ মাস পর ছাগীকে পাল দেয়া উত্তম।
- পাল দেওয়ার জন্য নির্বাচিত পাঁঠা সব সময় নিঃরোগ, ভাল বংশের ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের হতে হবে।
- ছাগলের সুস্থ বাচ্চার জন্য ছাগীর বাবা বা দাদা বা ছেলে বা নাতীকে দিয়ে প্রজনন করানো যাবে না।

পাঁঠা পালন ব্যবস্থাপনা ঃ

- একটি পাঁঠা সাধারণতঃ ৩/৪ মাস বয়সে যৌবন প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আট/নয় মাস বয়সের পূর্বে পাল দেয়ার জন্য ব্যবহার করা সঠিক নয়।
- খামার ব্যবস্থাপনায় প্রজননের জন্য দশটি ছাগীর বিপরিতে একটি পাঁঠাই যথেষ্ট।
- পাঁঠাকে প্রজনন কাজে ব্যবহার করা না হলে তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে শুধু ঘাস খাওয়ালেই চলে, তবে প্রজনন কাজে ব্যবহার করা হলে ওজন ভেদে ঘাসের সাথে দৈনিক ২০০-৫০০ গ্রাম পরিমাণ দানাদার খাবার দিতে হবে।
- পাঁঠাকে প্রজননক্ষম রাখার জন্য প্রতিদিন পাঁঠাকে ১০ গ্রাম পরিমাণ গাঁজানো ছোলা দেয়া প্রয়োজন।
- ২৮-৩০ কেজি ওজনের পাঁঠার জন্য দৈনিক ৪০০ গ্রাম পরিমান দানাদার খাবার দেয়া প্রয়োজন। কোন ভাবেই পাঁঠাকে বেশী চর্বি জমতে দেয়া যাবে না।
- একটি পাঁঠা ১০ মাস থেকে ৩ বছর পর্যন্ত প্রজননক্ষম থাকে।

দুগ্ধবতী ও গর্ভবতী ছাগীর পরিচর্যা ঃ

- দুগ্ধবতী ছাগল তার ওজনের ৫-৬ শতাংশ হারে শুষ্ক পদার্থ খেয়ে থাকে।
- একটি তিন বছর বয়স্ক ২য় বার বাচ্চা দেয়া ছাগীর গড় ওজন ৩০ কেজি হারে দৈনিক ১.৫-১.৮ কেজি শুষ্ক পদার্থ খেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ১-১.৫ কেজি পরিমান শুষ্ক পদার্থ ঘাস থেকে (৩-৫ কেজি কাঁচা ঘাস) বাকি ০.৫-০.৮ কেজি শুষ্ক পদার্থ দানাদার খাদ্য থেকে দেয়া উচিত।
- একটি গর্ভবতী/দুগ্ধবতী ছাগলকে প্রতিদিন ২৫০-৪০০ মি.লি টাটকা ভাতের মাড় দিতে হবে। তবে ভাতের মাড় বাসি হলে ছাগলের পেট খারাপ করতে পারে।

- যেহেতু ছাগী বাচ্চা দেয়ার ১.৫-২.০ মাসের মধ্যে গর্ভবতী হয় সেজন্য প্রায় একই পরিমানের খাবার গর্ভাবস্থায়ও ছাগলকে দিতে হবে।
- গর্ভবতী ছাগীর দানাদার মোট খাদ্যকে সমান দুই ভাগ করে সকালে ও বিকালে সরবরাহ করণ।
- গর্ভবতী ছাগীর খাদ্যে হঠাৎ পরিবর্তন আনা যাবে না, যেমন গর্ভবতী ছাগী কাঁচা ঘাসে অভ্যস্ত থাকলে তাকে হঠাৎ ইউ.এম.এস দেয়া ঠিক হবে না।
- বাচ্চা প্রসবের পর ছাগলকে প্রতি লিটার পানিতে ২০ গ্রাম চিটাগুড় এবং ২ গ্রাম লবন মিশ্রিত পানি ২-৩ লিটার পর্যন্ত পান করালে বাচ্চা প্রসবের ধকল কমে আসে।
- এ সময়ে প্রসবকৃত ছাগীকে অল্প টাটকা জাউভাত ও ভাল ঘাস সরবাহ করতে হবে।
- সময়মত ফুল (Placenta) পড়লে তখন সাথে সাথে তা সরিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। উপকারিতা।

নবজাত ছাগলের বাচ্চার পরিচর্যা

- প্রসবের পর পরই নবজাত বাচ্চার মুখমণ্ডল হতে পিচ্ছিল জাতীয় পদার্থ বা ময়লা পরিস্কারকরণ।
- পায়ের ক্ষুর ও নাভী কাটার পর সেখানে জীবানু নাশক ঔষধ দিয়ে মুছে দেয়া।
- বাচ্চাকে মায়ের সামনে রাখতে হবে, যাতে মা সহজে বাচ্চাকে চেটে পরিস্কার রাখতে পারে।
- নবজাত ছাগলের বাচ্চাকে দ্রুত (জন্মানোর আধ ঘন্টার মধ্যে) শাল দুধ খাওয়াতে হবে।
- ছাগলের বাচ্চা ঠান্ডায় কাতর, সে জন্য বাচ্চার শীত নিবারণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ডায়রিয়া বাচ্চা মৃত্যুর অন্যতম কারণ। এজন্য বাচ্চাকে সব সময় পরিচ্ছন্ন জায়গায় রাখতে হবে।
- একটি দেড় কেজি ওজনের বাচ্চাকে প্রথম মাসে গড়ে দৈনিক ২০০-৩০০ মি,লি, দ্বিতীয় মাসে ৩০০-৪০০ মি.লি এবং তৃতীয় মাসে ৪৫০-৬০০ মি.লি দুধের প্রয়োজন, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বাচ্চা অতিরিক্ত দুধ না খায়, তাহলে পেট খারাপ করতে পারে।
- বাচ্চার সংখ্যা বেশী হলে এবং চাহিদার তুলনায় কম দুধ থাকলে প্রয়োজনে অন্য ছাগী থেকে দুধ খাওয়াতে হবে।
- এ ক্ষেত্রে দুধ খাওয়ানোর আগে ফিডার, নিপলসহ আনুসাংগিক জিনিসপত্র পানিতে ফুটিয়ে জীবানুমুক্ত করে নিতে হবে।
- বাচ্চাকে অন্তত ১.৫-২.০ ঘন্টা পর পর মায়ের দুধ খেতে দেয়া প্রয়োজন।
- বাচ্চার বয়স ৬০-৯০ দিন হলে দুধ ছেড়ে দেবে।
- সাধারণত ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগীকে প্রয়োজনমত খাওয়ালে বাচ্চার প্রয়োজনীয় দুধ পাওয়া যায়।
- ছাগলের বাচ্চাকে জন্মের প্রথম সপ্তাহ থেকে ঘাসের সাথে পরিচিত করে তুলতে হবে, তবে মায়ের সাথেই বাচ্চা ঘাস খেতে শিখে এবং দুই সপ্তাহ থেকেই বাচ্চা অল্প অল্প ঘাস খায়।
- বাচ্চাকে কচি ঘাস যেমন ঃ দুর্বা বা অন্যান্য কচি ঘাস খাওয়ানো যেতে পারে। তাছাড়া ইপিল ইপিল, কাঁঠাল পাতা, ধইনচা ইত্যাদি পাতা খাওয়ানো যেতে পারে।
- বাচ্চার ১মাস বয়স থেকেই ধীরে ধীরে কাঁচা ঘাস এবং দানাদার খাদ্যে অভ্যস্থ করতে হবে।
- ছাগল ছানা প্রথমে মায়ের সাথেই দানাদার খাবার খেতে অভ্যস্থ হয়।
- যে সব পাঁঠা বাচ্চা প্রজনন কাজে ব্যবহৃত হবে না, তাদেরকে ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে খাসি করাতে হবে।

৫ম সেশন

সিআইজি সদস্যদের কার্যক্রম; পরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তা সেশনে যা আলোচনা করা হবে ঃ

সিআইজি এর কার্যক্রম ঃ

১. কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপ (CIG) হচ্ছে কিছু সংখ্যক কৃষক বা খামারীদের নিয়ে এমন একটি সংগঠন যাদের জীবিকা নির্বাহে মূখ্য কর্মকান্ড সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এদের অধিকাংশ সদস্য একই আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পন্ন ও পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রয়েছে।

২. এনএটিপি-২ প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিয়নে ৩টি প্রাণিসম্পদ CIG গঠন করা হয়েছে, যেখানে প্রতিটি CIG-তে ৩০ জন কৃষক বা খামারী সদস্য রয়েছে। এদের মধ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক খামারী ৮০% এবং বড় ও মাঝারীসহ অনান্য খামারী ২০% সদস্য থাকতে পারবেন। উপজেলার মোট সিআইজি এর মধ্যে নারী সদস্যদের সংখ্যা হবে ন্যূনতম ৩৫%।

৩. CIG পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা করার জন্য ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাহী কমিটি গঠন করতে হবে। গোপন ভোটে বা সমঝোতার ভিত্তিতে কমিটি গঠিত হবে। এজন্য ৭ (সাত) দিন পূর্বে একটি সভা অনুষ্ঠানের জন্য স্থান, সময় ও তারিখ উল্লেখ পূর্বক নোটিশ প্রদান করতে হবে।

৪. নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ হবে :

১) সভাপতি	-	১ জন
২) সহ-সভাপতি	-	১ জন
৩) সম্পাদক	-	১ জন
৪) কোষাধ্যক্ষ	-	১ জন
৫) সদস্য	-	৫ জন

উক্ত কমিটির নাম জনগণের দেখার জন্য কমিটির তালিকা একটি উন্মুক্ত স্থানে টানানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সহযোগিতা প্রদান করবেন। কমিটির মেয়াদ হবে ২ বছর। কমিটি গঠন সংক্রান্ত রেজুলেশন রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরবর্তীতে মাসিক ও বিশেষ সভার রেজুলেশন উক্ত রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

CIG নির্বাহী কমিটির প্রধান প্রধান কার্যাবলী ঃ

CIG গঠন ও ব্যবস্থাপনা হলো কমিউনিটি মোবিলাইজেশনের একটি প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে CIGগুলো নিজেদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ, অগ্রাধিকার নির্ধারণ, স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার পরিকল্পণা প্রণয়ন, উন্নত বাজার ব্যবস্থাপনা, মাইক্রোপ্লান প্রণয়ন ইত্যাদি সম্পাদনে সক্ষমতা অর্জন করবে। UEFT তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন। CIG নির্বাহী কমিটির প্রধান প্রধান কার্যাবলী নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

১. নির্বাহী কমিটি CIG সদস্যদেরকে মাসিক সঞ্চয়ের মাধ্যমে তহবিল গঠনে উদ্বুদ্ধ করবে এবং স্থানীয় যে কোন একটি তফসিলি ব্যাংকে CIG এর নামে ব্যাংক হিসাব খুলে অর্থ জমা করবে। সে সঙ্গে সদস্যদের মাসিক সঞ্চয় এর টাকা একটি পৃথক রেজিষ্টারে রেকর্ডভূক্তি করে হিসাব সংরক্ষণ করবে। CIG সদস্যগণ মাসিক সঞ্চয়ের হার বা পরিমাণ নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেবেন।

২. নির্বাহী কমিটি CIG সমষ্টিগত স্বার্থে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ ও মজুদ অর্থ ব্যবহারে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবেন।

৩. নির্বাহী কমিটি সমবায় দপ্তরে CIG নিবন্ধন (CIG Registration) করে CIG-কে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের এর ব্যবস্থা নেবেন।

৪. নির্বাহী কমিটি প্রাণিসম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে CIG সদস্যদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও উহা সমাধানে প্রতি বৎসর প্রযুক্তি প্রদর্শনী গ্রহণ, গবাদি প্রাণি-হাঁস-মুরগীর কৃমিণাশক

ও টিকা প্রদানের ক্যাম্পিং, ইত্যাদি বাস্তবায়নে সিআইজি মাইক্রোপ্লান প্রণয়ন ও তা উপজেলা সম্প্রসারণ প্রকল্পে অন্তর্ভূক্তির নিমিত্তে Community Extension Agent for Livestock (CEAL) এর নিকট প্রেরণ করতে হবে।

৫. উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্তে CIG সদস্যগণ প্রদর্শণী থেকে প্রাপ্ত প্রযুক্তি নিজ নিজ খামারে ব্যবহার করবেন এবং প্রত্যেক CIG সদস্য উক্ত প্রযুক্তি নিজ খামারের পার্শ্ববর্তী কমপক্ষে ৩(তিন) জন নন-সিআইজি কৃষক/খামারীকে গ্রহনে উদ্বুদ্ধ করবেন (পরবর্তীতে উন্নত প্রযুক্তিব্যবহার বিষয়ে নন-সিআইজি কৃষক/খামারীদেরকেও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হবে)।

৬. নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারকারী সিআইজি ও নন-সিআইজি সকল সদস্যদের নাম, ঠিকানা এবং উক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারের পূর্বে ও পরে উৎপাদনের রেকর্ড একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করবেন।

৭. CEAL এর সাথে যোগাযোগ ও পরামর্শ করে সিআইজি সদস্যদের প্রযুক্তিগত সমস্যা সমাধান করবেন।

৮. CEAL সদস্যদের সহযোগিতায় বিভিন্ন উপকরণ যেমন প্রাণি খাদ্য, মুরগির বাচ্চা, বিভিন্ন সংক্রামক/মারাত্মক রোগের টিকা, উন্নতজাতের ঘাসের কাটিং ইত্যাদি সময়মত সহজলভ্য করা অথবা পরামর্শ দেবেন।

৯. CIG -এর নির্বাহী কমিটির সভায় প্রযুক্তি বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহনের জন্য CEAL সদস্যদের আমন্ত্রণ জানাবেন, ইত্যাদি।

১০. নির্বাহী কমিটি মাসে কমপক্ষেএকবার অথবা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিয়মিতভাবে CIG-এর সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেয়া।

CIG -এর সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা ঃ

CIG -এর সঞ্চয় কার্যক্রম ঃ

CIG-কে একটি কার্যকরী সংগঠন হিসেবে টিকে থাকতে হলে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, এর জন্য প্রয়োজন CIG-এর নিজস্ব তহবিল। CIG সদস্যদের সঞ্চয়ের মাধ্যমে এই তহবিল গঠিত হতে পারে। নির্বাহী কমিটি CIG সদস্যদেরকে মাসিক সঞ্চয়ের মাধ্যমে তহবিল গঠনে উদ্বুদ্ধ করবে এবং স্থানীয় যে কোন একটি তফসিলি ব্যাংকে CIGএর নামে ব্যাংক হিসাব খুলে অর্থ জমা করবে। সে সঙ্গে সদস্যদের মাসিক সঞ্চয় এর টাকা একটি পৃথক রেজিষ্টারে রেকর্ডভূক্তি করে হিসাব সংরক্ষণ করবে। CIG সদস্যগণ মাসিক সঞ্চয়ের হার বা পরিমাণ নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নিবেন। উক্ত তহবিলের মাধ্যমে CIG সদস্যগণ ব্যক্তিগত বা সংগঠনগতভাবে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ করতে পারে। নির্বাহী কমিটি CIG সমষ্টিগত স্বার্থে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ ও মজুদ অর্থ ব্যবহারে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবেন। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। এ জন্য-

১. সঞ্চয়ের জন্য প্রত্যেক সদস্যের ব্যক্তিগত পাশবই এবং CIG -এর জন্য একটি রেজিষ্ট্রার খুলতে হবে। রেজিষ্টারটি CIG -এর কোষাধ্যক্ষ সংরক্ষণ করবে।

২. যে কোন তফসিলি ব্যাংকেCIG -এর নামে একটি ব্যাংক হিসাব খুলতে হবে।

৩. CIG -এর সভাপতি, সেক্রেটারী ও কোষাধ্যক্ষ-এর যৌথ নামে ব্যাংক হিসাব খুলতে হবে, তবে যে কোন দুইজনের স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে, যেখানে কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর অবশ্যই থাকতে হবে।

৪. বার্ষিক সাধারন সভায় CIG -এর আয়-ব্যয় সম্পদ ও দায়ের হিসাব প্রস্তুতপূর্বক উপস্থাপন করতে হবে।

৫. CIG সমষ্টিগত স্বার্থে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।

৬. CIGহিসাব সংক্রান্ত সকল প্রকার কর্মকান্ডের তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে।

৭. সঞ্চয়ের মাধ্যমে গঠিত তহবিল ব্যক্তিগত বা সংগঠনগতভাবে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ করতে পারবে।

৮. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৯. প্রকল্প থেকে ম্যাচিং গ্র্যান্ট সুবিধা নিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করবে ইত্যাদি।

১০. সিআইজি সঞ্চয় কার্যক্রমের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার জন্য প্রতিটি সিআইজি-তে ১টি সঞ্চয় রেজিষ্টার রাখতে হবে। সিআইজি সদস্য/সদস্যাদের সঞ্চয়ের হিসাব রাখার জন্য রেজিষ্টারে নিম্নোক্ত ছক ব্যবহার করা যেতে পারে:

ক্রমিক ইং	সদস্য/সদস্যাদের	প্রারম্ভিক/পূর্বের জের	মাসের নাম:					মাসের নাম:	
			এ মাসে জমা	এ পর্যন্ত জমা	এ মাসে উত্তোলন	এ পর্যন্ত উত্তোলন	মাস শেষে ব্যালান্স	এ মাসে জমা	এ পর্যন্ত জমা
১									
২									
৩-২৯									
৩০									
	সঞ্চয়ের লাভ/ অন্যান্য প্রাপ্তি								
	মোট প্রাপ্তি								
	ব্যয়								
	অবশিষ্ট								

বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা ঃ

সিআইজির সঞ্চিত তহবিল বিভিন্ন উৎপাদনশীল ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সদস্য/সদস্যাদের মাধ্যমে বিনিয়োগ করা যাবে। এ জন্য সিআইজি সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিষয় যেমন বিনিয়োগযোগ্য কর্মকান্ডের বিবরণ, বিনিয়োগের পরিমাণ, ব্যবহারের শর্তাবলী, বিতরণকৃত অর্থ ফেরতের সিডিউল ইত্যাদি সভার কার্যবিবরণীতে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকতে হবে। প্রতিটি বিনিয়োগের আলাদা আলাদাভাবে হিসাব রাখতে হবে।

পরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তা

১. পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা হচ্ছে পার্শ্ববর্তী এলাকায় ক্ষতিকর কর্মকান্ড থেকে পরিবেশ ও সমাজকে রক্ষা করা,অর্থাৎ প্রাণিসম্পদ এর সম্প্রসারণ কর্মকান্ডের ফলে যাতে পরিবেশ ও সমাজ ব্যবস্থায় কোন প্রকার বিরূপ প্রভাব না ঘটে সে দিকে সচেতন থাকতে হবে।

২. তাই অত্র প্রকল্পে প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কার্যক্রমে পরিবেশ ও সামাজিক বিরূপ প্রভাব হয় এ ধরণের কোন কার্যক্রম গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

৩. প্রাণিসম্পদ সিআইজি মাইক্রোপ্ল্যান প্রণয়নের সময় যাতে জীব বৈচিত্র্য হারিয়ে না যায় বা পরিবেশ দূষণের ফলে প্রাণির স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রেখে পরিকল্পনা নিতে হবে। এ জন্য পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়ে সিআইজি ও সিল সদস্যদের-কে উদ্বুদ্ধ পূর্বক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৪. প্রণির দেহে বিভিন্ন পথে রোগে-জীবনু প্রবেশ করতে পারে, যেমন- মুখ, নাক, পায়ুপথ, দুধের বাট, চামড়ার ক্ষতস্থান, চোখ, ইত্যাদি। সাধারণত পরিবেশ সুরক্ষা না থাকলে এ সকল পথে রোগে-জীবনু সহজেই প্রবেশ করতে পারে। যেমনপরিবেশে বাতাস/পানি দুষিত থাকলে, রোগাক্রান্ত/মৃত প্রাণির যথাযথ ব্যবস্থা না নিয়ে চলাচল/স্থানান্তর করা হলে, প্রাণির পরিচর্যাকারী কোন রোগাক্রান্ত প্রাণির সংস্পর্শে এসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিয়ে সুস্থ প্রাণির পরিচর্যা করলে, প্রাণিকে পঁচা/বাসি খাদ্য সরবরাহ করা হলে, হাট/বজারে অসুস্থ প্রাণি নিয়ে আসলে, ইত্যাদি। তাই পরিবেশ সুরক্ষায় এ সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫. প্রাণির রোগ মুক্তি ও পরিবেশ সুরক্ষায় মৃত প্রণি যত্রতত্র মাঠে ময়দানে বা ঝোপঝাড়ে না ফেলে মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে।

৬. বাজার/অন্য কোনভাবে ক্রয়কৃত প্রাণিকে বাড়িতে/খামারে এনে সরাসরি অন্য প্রাণির সঙ্গে রাখা যাবে না। প্রয়োজন বোধে উক্ত প্রণিকে ৭-২১ দিন পর্যন্ত পৃথকভাবে রেখে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ সময়ের মধ্যে যদি নতুন প্রণির মধ্যে রোগের কোন লক্ষণ প্রকাশ না প্রায়, তখন বুঝতে হবে বাড়ির/খামারের অন্যান্য প্রাণির সাথে এই প্রণিকে একত্রে পালতে কোন সমস্যা নাই।

৭. প্রাণিকে সময়মত টিকা প্রদান ও কৃমিনাশক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। নিজের খামারের প্রণিকে টিকা প্রদানের সাথে সাথে পার্শ্ববতী বাড়ি/খামারের প্রাণিকেও ঠিক একই প্রকারের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. পোলট্রির সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ কল্পে জীবনিরাপত্তায় নিম্নে বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে ঃ

- অসুস্থ প্রাণিকে পৃথকী করণ।
- খামারে অভন্তরে বহিরাগতদের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণকরণ।
- একটি সেডে একই বয়সের ব্রীড এর হাঁস/মুরগী পালন।
- স্বাস্থ্যবিধান (Sanitation) পদ্ধতি যথাযথভাবে পালন।

৯. প্রাণির বাসস্থান/খামার/আঙ্গিনা দৈনিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে।

১০. প্রাণিকে প্রত্যহ পরিষ্কার পানি, টাটকা খাদ্য খাওয়াতে হবে।

১১. প্রাণির খাবার পাত্র ও পানির পাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন করতে হবে।

১২. আর্সেনিক প্রবণ এলাকায় প্রাণিকে আর্সানিক মুক্ত পানি খাওয়ানোর বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

১৩. প্রণির উৎপাদিত পণ্য যেমন দুধ/মাংশ/ডিম এর গুণগত মান রক্ষায় সচেতন থাকতে হবে।

১৪. প্রাণির খাদ্য উপাদান ভেজালমুক্ত ও গুণগত মান হতে হবে।

১৫. প্রাণিকে সুষম খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

১৬. প্রাণির খামার স্থাপনে লোকালয়/মানুষের বাসস্থান থেকে একটু দূরে করতে হবে।

১৭. অতিরিক্ত শীত/গরম ও খড়া/বন্যা/প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় প্রাণি স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে। এ সময়ে ঘাস চাষ কম হয় এবং প্রণির খাদ্য অপ্রতুল/দুস্প্রাপ্য থাকে। অনেকে এ সময়ে প্রাণি বিক্রি করে পরবর্তীতে সামাজিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। তাই এ দিক বিবেচনায় রেখে অগাম প্রস্তুতি হিসাবে সময়পোযুগী দ্রুত বর্ধনশীল ঘাস চাষের ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৮. সম্প্রসারণ কার্যক্রমে মহিলা ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর স্বার্থ/সুবিধা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

১৯. পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষায় সিআইজি সদস্যদের সভায় উপরোক্ত বিষয়গুলো নিয়মিত আলোচনা করে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং পার্শ্ববর্তী নন-সিআইজি সদস্যদেরও বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে জানাতে হবে।

২০. পরিবেশে বায়ু দুষণ কমানোর জন্য প্রাণির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় সিআইজি/সিল/এডপ্টারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

মুরগীর খামারে জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা

জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা হল সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনার একটি অংশ যা অবশ্যই রোগ জীবানুর বিস্তারের সম্ভাবনাকে হ্রাস করে। রোগবালাই থেকে মুক্তরাখতে সকল ব্যবস্থা সমূহকে নিশ্চিতকরণ এর নাম জীবনিরাপত্তা। একটি পরিকল্পনার মাধ্যমে এমনভাবে পোল্ট্রিফার্ম তৈরি করতে হবে, যাতে সেখানে কোন রোগ বালাই এর জীবানু ঢুকতে না পারে। ফলে খামারিরা লাভবান হতে পারবেন।

মুরগীর রোগবালাই এর মূল কারণ হচ্ছে ঃ

- ভাইরাস (এভিয়ান ইনফুয়েনজা, রানীক্ষেত, ইত্যাদি)
- ব্যাক্টেরিয়া (ফাওল কলেরা, সালমোনেলা, ইত্যাদি)
- ফাংগাস (এসপারজিলোসিস, মোল্ড, ইত্যাদি)
- প্রোটোজোয়া এবং প্যারাসাইট (কক্সিডিওসিস, কৃমি)

এই রোগগুলো যদি খামারে ঢুকতে না পারে তাহলে মুরগির স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এবং অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হওয়া যাবে।

রোগ-বালাই ছড়ানোর পদ্ধতি ঃ

নিম্নলিখিতভাবে রোগ ছড়াতে পারে ঃ

- ❖ সরাসরি ছড়ানো
- ❖ মুরগি থেকে মুরগি
- ❖ হাঁস থেকে মুরগি
- ❖ শুকর থেকে মুরগি
- ❖ ইঁদুর থেকে মুরগি
- ❖ বন্যপাখি থেকে মুরগি
- ❖ কুকুর-বিড়াল থেকে মুরগি, ইত্যাদি

মানসম্পন্ন খাদ্য ও পানি ঃ

প্রস্তুতকৃত খাদ্য যেন গুণগত মান সম্পন্ন হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। খাদ্য পরিচ্ছন্ন পরিবেশে ভালভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। আর্দ্র ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সংরক্ষণ করলে খাদ্যে মাইকোটক্সিন উৎপন্ন হতে পারে। সেই সাথে অন্যান্য জীবানু যেমন সালমোনেলা, ইকলাই, ককসিডিয়া ইত্যাদির সংক্রমন হতে পারে। খাদ্য ও পানির পাত্র যেন মুরগীর পায়খানা দ্বারা দুষিত না হতে পারে তার জন্য মুরগীর উচ্চতা অনুযায়ী উপরের দিক থেকে পাত্র ঝুলিয়ে দিতে হবে। খাদ্য ও পানির পাত্র নিয়মিত পরিস্কার করতে হবে।

স্বাস্থ্যকর পরিবেশে সংরক্ষণ ঃ

স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পোল্ট্রি উৎপাদন ও রোগ নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কঠিন ও ব্যয়বহুল নয়। নিচের বিষয়গুলো মেনে চললে সহজেই স্বাস্থ্যকরভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

১। **নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্নকরণ ঃ** মুরগীর খামারের শ্রমিকরা প্রতিদিন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে এবং হাত পা জীবানুমুক্ত করে শেডে প্রবেশ করবে। প্রথমে অসুস্থ ও মরা মুরগী দ্রুত সরিয়ে ফেলবে এবং নিয়মিত মুরগীর বিষ্ঠা পরিস্কার করবে।

২। **অযাচিত প্রাণি ঃ** খাদ্য এবং অব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ইঁদুর, বিড়াল, ছুঁচো ইত্যাদি প্রাণির বসবাসের জন্য খুবই সহায়ক। এরা নিজেরা বিভিন্ন রোগের উৎস হিসেবে কাজ করে এবং মল মূত্রাদির মাধ্যমে রোগ ছড়াতে পারে।

৩। **পোকাকামড় নিয়ন্ত্রণঃ** পোকা কামড় রোগের উৎস ও পরজীবি বা অন্য রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে। এক ব্যাচ শেষ করার পর খামারের সকল আবর্জনা, মাকড়সার ঝুল একত্রে করে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে অথবা কম্পোষ্টিং পিটে ফেলতে হবে। সকল যন্ত্রপাতি ও ঘর ঝাড়ু দিয়ে পরিস্কার পানি দিয়ে ধোঁয়ার পর জীবানু নাশক দিয়ে জীবানুমুক্ত করতে হবে।

৪। **হিংস্র জন্তু ও অন্যান্য পাখি নিয়ন্ত্রণ ঃ** এরা বিভিন্ন সংক্রামক ও পরজীবি জনিত রোগের জীবানু বহন করে। মৃত মুরগী যত্রতত্র ফেলে রাখলে সেগুলো খাওয়ার জন্য খামারে কাক বা বন্য পাখি, বন বিড়াল, শিয়াল, কুকুর ইত্যাদি আসতে পারে। খামারের পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করণের মাধ্যমে এবং বন্য পাখি নিয়ন্ত্রক ব্যবহার করে এদের নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক।

৫। **মৃত মুরগী সৎকার ঃ** মৃত মুরগীর দেহাবশেষ নিজেই রোগের উৎসে পরিণত হয় যা খামারের অন্যান্য মুরগীতে এবং আশেপাশের খামারের সংক্রমনের উৎস হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৃত মুরগীর সৎকার করা যায়। যেমনঃ (ক) পোড়ানোঃ সংক্রামক জীবানুকে ধ্বংস করার সর্বোত্তম পদ্ধতি বাণিজ্যিকভাবে ধোঁয়াবিহীন, দুর্গন্ধবিহীন পোড়ানোর চুলি বাজারে সহজলভ্য। (খ) গভীর গর্তে পুঁতে ফেলাঃ পরিবেশ আইন মেনে বড় গর্ত করে আবর্জনা গভীর গর্তে পুঁতে ফেলাই উত্তম। এতে শিয়াল, কুকুর জাতীয় প্রাণী বর্জ্যের নাগাল পাবে না। সাধারণ বর্জ্যের জন্য ছোট গর্ত করে বিভিন্ন বর্জ নিষ্কাশন করা যায়।

৭। **পৃথকীকরণ ঃ** অনুজীবের বিস্তার পৃথকীকরণের মাধ্যমে ঠেকানো সম্ভব। রুগ্ন বা আক্রান্ত মুরগীকে স্বাস্থ্যবান নিরোগ মুরগী থেকে পৃথক করে রাখা উচিত এবং নিরোগ মুরগীকে পরিচর্য্যার জন্য ভিন্ন শ্রমিক নিয়োগ করা উচিত। সবচেয়ে ভাল হয় রুগ্ন মুরগীকে বর্জ্য হিসেবে সৎকার করে ফেলা, কারণ এই সব রুগ্ন মুরগী আরোগ্য লাভ করলেও দীর্ঘ সময় ধরে জীবানুবাহক হিসেবে কাজ করতে পারে।

৮। **ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ঃ** ব্যবস্থাপক, সুপারভাইজার এবং খামারের মালিকগণকে পরিচ্ছন্নতা নিয়মাবলী অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। খামারে দর্শণার্থী প্রবেশ যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। বিশেষ প্রয়োজনে যদি কোন দর্শণাথী মুরগীর শেডে প্রবেশ করতে চায় তবে জুতা পরে জীবানুনাশক দ্রবণে হাত পা ধুঁয়ে খামারে প্রবেশ করতে হবে।

৯। **টিকা প্রয়োগ ঃ** মুরগীকে সংক্রামক ব্যাধি থেকে রক্ষার জন্য টিকা দেওয়া অত্যাবশ্যক। কিছু রোগ সঠিক সময়ে গুণগত মান সম্পন্ন টিকা প্রদানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব।

পরিবেশ সুরক্ষায় খামারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে আলোচনা ঃ

১. গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগি ইত্যাদির সরবরাহকৃত খাদ্যের ৫০-৬০% মল ও মূত্র হিসাবে বেরিয়ে আসে যা আংশিক বা পরিপূর্ণভাবে নষ্ট বা অপচয় হওয়ার কারণে পরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটে।

২. খামার ব্যবস্থাপনায় গবাদিপ্রাণিকে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করায় রুমেন থেকে মিথেন উৎপাদন প্রায় ৩০% হ্রাস পায় ও পরিবেশ সুরক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৩. প্রাণির রোগ মুক্তি ও পরিবেশ সুরক্ষায় মৃত প্রাণির চামড়া ছাড়ানো যাবে না। মৃত পশু-পাখী যত্রতত্র মাঠে ময়দানে বা ঝোপঝাড়ে না ফেলে মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে।

৪. প্রাণিকে নিয়মিত টিকা দিতে হবে।

৫. পরিবেশ সুরক্ষায় গোবর/বিষ্ঠা, মূত্র, প্রণি খাদ্যের উচ্ছিষ্ট ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ যথাযথভাবে ও সময়মত অপসারণ করলে পরিবেশ সুরক্ষিত হবে। একাজে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট করা যেতে পারে।

৬. গোবর/বিষ্ঠা থেকে কম্পোষ্ট সার প্রস্তুত করা হলে একদিকে পরিবেশে দূর্গন্ধ দুর হয় ও অন্যদিকে উৎপাদিত কম্পোষ্ট সার কৃষিতে ব্যবহার করায় কৃষির উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়।

৭. বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে পরিচ্ছন্ন জ্বালানী উৎপাদন হওয়ায় দুষণমক্ত বায়ু ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি ও উন্নত মানের জৈব সার উৎপাদন হয়। তাই বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট সামাজিক নিরাপত্তায় অবদান রাখছে।

৮. বর্জ্য সঠিকভাবে কম্পোষ্ট করা হলে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস মারা যায় ও প্রাণির রোগ নিয়ন্ত্রিত হয়।

৯. খড় এর সাথে মোলাসেস মিশিয়ে গো/মহিষকে খাওয়ালে গো/মহিষ থেকে ৩০-৩৫% মিথেন গ্যাস উৎপাদন কমে আসবে এবং পরিবেশ দুষণ প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

কম্পোস্টিং এর মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাঃ

কম্পোস্ট ও কম্পোষ্টিং প্রক্রিয়া

- ❖ কম্পোস্ট হচ্ছে পচাঁ জৈব উপকরণের এমন একটি মিশ্রণ যা উষ্ণ আর্দ্র পরিবেশে অনুজীব কর্তৃক প্রক্রিয়াজাত হয়ে উদ্ভিদের সরাসরি গ্রহন উপযোগী পুষ্টি উপকরণ সরবরাহ করে।
- ❖ কম্পোষ্টিং বা পচানো হচ্ছে প্রাকৃতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত একটি জৈবপচন প্রক্রিয়া, যা জৈব পদার্থকে স্থিতিশীল দ্রব্যে রূপান্তর করে।
- ❖ যে সকল অনুজীব পচনশীল পদার্থকে তাদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার কবে, সে সকল অনুজীবের উপর এ প্রক্রিয়া নির্ভরশীল।
- ❖ কম্পোষ্টিং প্রক্রিয়ায় বর্জ্যের গন্ধ ও অন্যান্য বিরক্তিকর সমস্যা সম্বলিত পদার্থকে স্থিতিশীল গন্ধ ও রোগ জীবানু, মাছি ও অন্যান্য কীট পতঙ্গের প্রজননের অনপুযোগী পদার্থে রূপান্তরীত করে।
- ❖ এই প্রক্রিয়াটি চলার সময় নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পরিত্যক্ত বর্জ্যে প্রক্রিয়ার ফলে যে তাপ উৎপন্ন হয় তাতে রোগ জীবানু ধ্বংস হয়ে যায়।
- ❖ মুরগির বিষ্টা ও আবর্জনার প্রকারভেদে কম্পোস্ট সার প্রস্তুত হওয়ার সময় ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। তবে কম্পোস্ট সার হিসাবে তখনই উপযুক্ত হবে যখন তার রং গাড় বাদামী হবে, তাপ কমে আসবে এবং একটা পঁচা গন্ধ বের হবে।
- ❖ কম্পোষ্ট তৈরীর জন্য খামারের একপাশে একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে স্থানটি চারদিকে নির্দিষ্ট মাপের (দৈর্ঘ্য ৮ ফুট, প্রস্থ ৫ ফুট ও গভীরতা ৫ ফুট) ইট দিয়ে ঘিরে একটি পিট তৈরী করতে হবে। জৈব বর্জ্যের মিশ্রণ খড়, মুরগীর দেহাবশেষ, বিষ্ঠা ও পানির অনুপাত হবে যথাক্রমে ১ ঃ ১ ঃ ১.৫ ঃ ০.৫ । প্রতি স্তরে তিন ভাগ পানি যোগ করতে হবে। উক্ত অনুপাত ঠিক রেখে মিশ্রণটি তৈরী হলে দ্রুত এবং গন্ধহীনভাবে বর্জ্য কম্পোষ্টিং হবে। কম্পোষ্টিং প্রক্রিয়া ১৪ দিনের মধ্যে সঠিকভাবে সম্পন্ন হবে।

প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও প্রশিক্ষণ সমাপনি অনুষ্ঠান

প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন, সারা দিন প্রশিক্ষণের সার সংক্ষেপ আলোচনা ও সমাপ্তিকরণ ঃ

- প্রশিক্ষণ সংগঠক প্রশিক্ষণ সমাপ্তি অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন।
- তিনি প্রশিক্ষণ মূল্যায়নে ২/৩ জন প্রশিক্ষণার্থীকে তাঁদের অনুভূতি প্রকাশের জন্য আহ্বান জানাবেন।
- এ সময় প্রশিক্ষণার্থীগণ খোলামেলাভাবে প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন করবেন এবং প্রশিক্ষণ থেকে তাঁদের প্রাপ্ত জ্ঞান খামার পরিচালনায় বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোকপাত করবেন।
- পরিশেষে প্রশিক্ষণ সংগঠক এক দিন প্রশিক্ষণের সার সংক্ষেপ আলোচনা করবেন এবং সিআইজি সদস্যগণকে প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান নিজ নিজ খামারে কাজে লাগিয়ে প্রাণির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উদ্বুদ্ধ করে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।